ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1363-1379
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.357

শরৎ সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় শ্রেণির ভাষা-সংলাপ

কিরণ মণ্ডল, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Language is the main medium of expressing human feelings, which is expressed by Vocally uttering Sounds. According to expressionism, it may be oral, written or symbolic. We have brought up the written language as for review, because by this the literature is highlighted. As we represent here the language of the lower classes, so beside this the issue of casteism, the elite context and the Composition style have come up. The narrative language of sarat Chandra and the communicative dialect of his characters make the characters alive. We have seen the uses of language on mental structure of characters, besides the uses of the speakers, listeners and language composition. And also, we can see Underlexicalization and Overlexicalization of language. The sentence structure of literature, figurative position, and vocabulary of sarat Chandra is very appropriate and clear. He has represented the woes of the lower classes clearly and simply to the readers.

Keywords: Lower classes, Casteism, Dialect, alive, Mental structure, Underlexicalization, Overlexicalization, Figurative position, woes.

ভাষা হল মানুষের মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। যা বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে ভাব প্রকাশ করে। প্রকাশের ভিত্তিতে ভাষা কথ্য, লেখ্য এবং সাংকেতিক হতে পারে। মুখের ভাষা কথ্য, লেখার ভাষা লেখ্য এবং ইশারা বা সংকেতের ভাষা সাংকেতিক হয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় লেখ্য ভাষা কেননা এই ভাষা দিয়েই গড়ে ওঠে সাহিত্য। ভাষার কার্যক্রমে সাহিত্য বিশেষ মাত্রা পায়। কথাসাহিত্য যেহেতু গদ্য ভাষায় রচিত এবং কাল্পনিক আখ্যানের মাধ্যমে জীবনের বিশ্লেষণ, তাই লক্ষ্য হয়ে ওঠে জীবনের সামগ্রিক রূপের অনুসন্ধান করা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষার অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থে বলেছেন—

> "কোঠাবাড়ির প্রধান মসলা ইঁট। তারপরে থাকে চুন সুরকির নানা বাঁধন। ধ্বনি দিয়ে আঁট বাঁধা শব্দই ভাষার ইঁট, বাংলায় তাকে বলি কথা। নানারকম শব্দচিহ্নের গ্রন্থি দিয়ে এই কথাগুলোকে গেঁথে গেঁথে হয় ভাষা।"[১]

এ প্রসঙ্গে বলে রাখি আমাদের পর্যালোচনার বিষয় যেহেতু নিম্নবর্গীয় শ্রেণির ভাষা তাই সেই সূত্রে আমরা ভাষার সঙ্গে জাতপাতের দিকটি একটু দেখার চেষ্টা করেছি। ভাষা ও জাতপাত বিষয়টি একে অপরের সঙ্গে জড়িত। কেননা ভাষাকে আমরা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবেই দেখি না, সেইসঙ্গে ভাষাকে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিচয়ের অংশ হিসাবে দেখা যায়। সামাজিক কাঠামোতে ভাষা বর্ণপ্রথার মতই একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর

পরিচয় হিসেবে কাজ করে। ভাষার মাধ্যমে একদিকে যেমন জাতপাতের ভেদাভেদ ও কুসংস্কার আরো বেশি শক্তিশালী হয় তেমনি অন্যদিকে আবার এই ভাষাকেই ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানানো হয়।

এবার আসি ভাষার আভিজাত্য প্রসঙ্গে। ভাষার আভিজাত্য বলতে মূলত কোন ধ্রুপদী ভাষার (Classical Language) সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, স্বতন্ত্র প্রকৃতি, সাহিত্যিক উৎকর্ষ, গাম্ভীর্য ও সুষমাকে বোঝায়। ভারতের মারাঠি, বাংলা, তামিল, সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষা তাদের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরিচয়কে বহন করে।

এছাড়া দেখি ভাষার আলোচনা সূত্রে 'Style' বা রচনারীতির প্রসঙ্গ উঠে আসে। যেহেতু স্রষ্টার ব্যক্তিধর্মের বিশেষত্ব ভাষার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, তাই ভাষা প্রসঙ্গে স্টাইল বা রচনারীতির আলোচনা করতেই হয়। ভাষা বিষয়টিকে বলতে পারি নমনীয় এক উপাদান, যাকে দুমড়ে-মুছড়ে অন্তহীন রূপ দেওয়া যায়। যার কারণে স্টাইল সম্ভবপর হয়ে ওঠে। শিল্পীর অন্তর-মানষকে সার্থকভাবে তুলে ধরে এই রচনারীতি। প্রতিটি লেখকের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা তার ধ্বনী-বিন্যাস, শব্দ সংস্থান, বাক্য যোজনা, অনুচ্ছেদ, স্তবক রচনা, রচনা শুরু ও উপসংহার প্রভৃতি সবকিছুর মধ্যেই প্রকাশিত হয়। স্টাইল বা রচনা প্রকরণে শিল্পীর নিজস্ব ব্যাক্তিকতার প্রসঙ্গটিকে পবিত্র সরকার মহাশয় তাঁর 'গদ্যরীতি ও পদ্যরীতি' গ্রন্থে লিখেছেন—

> "স্টাইল (Style) হল আলাদা হওয়া একটি norm বা আদর্শ থেকে সরে আসা। সাধারণ থেকে বিশেষে পৌঁছানো। যা সকলের তা থেকে ব্যক্তিগত কোন অংশে উত্তীর্ণ হওয়া।"[২]

অর্থাৎ আমরা দেখি লেখককে প্রচলিত শব্দ, বাক্য ব্যবহার না করে বরং তার চিন্তা ভাবনার প্রকাশ করতে সেগুলিকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে নিজস্ব রূপ দিতে হয়। শৈলী হল 'কেমন করে' (How)? প্রত্যেক লেখকের পারফর্মের নিজস্ব ধরন থাকে। লেখক কিভাবে শৈলীকে স্থাপন করেছেন, কেমন ধরনের ভাষা প্রয়োগ করেছেন? অর্থাৎ যেমন করে তিনি কাজটি সম্পন্ন করছেন তাকেই আমরা শৈলী বলি। ভাষাটা এখানে বাইরের উপাদান। ভিতরের উপাদান হল বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য শৈলী রাখা দরকার। শৈলী না রাখলে বিষয়টি প্রজ্বলিত হবে না। ধরা যাক আমরা যদি একটি মানুষের শুধু হাড় কটি বের করে দেখি তাতে কোন লাবণ্য থাকে না, চেতনাও থাকেনা। সেরকম সাহিত্যকে খামচে খামচে দেখলে লাবণ্যটা নষ্ট হয়ে যায়। শৈলী কিন্তু লাবণ্য নষ্ট করে না বরং লাবণ্যকে আরো উজ্জ্বল করে তোলে। অর্থাৎ শৈলী হচ্ছে বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি এমন উপাদান যা ভাষা দিয়েই প্রস্ফুটিত হয় কিন্তু ভাষার উপাদানগুলিকে সে কেমন করে কাজে লাগাচ্ছে সেটাই দেখার বিষয় হয়ে ওঠে। সকল সাহিত্যিকের শৈলী একই রকম নয়, সবার আলাদা আলাদা ফলে এটি ব্যক্তিনিষ্ঠ। তাছাড়া স্টাইল ব্যাপারটি আজকে যা আছে কালকে তা নাও থাকতে পারে। লেখক যে শৈলী দিয়ে গল্প উপন্যাস লেখা শুরু করেছিলেন পরিণত বয়সে একই শৈলী ব্যবহার করেননি; কারণ বারবার ভেঙেচুরে দেখেছেন ফলে বদল ঘটেছে শৈলীর। আমরা যদি তার ভাষা শিল্পের ব্যবহার ভালো করে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো উপন্যাস রচনা শুরুতে তাঁর সৃষ্ট গদ্যশৈলীর প্রাঞ্জলতা, সারল্য গুণ ও সংবেদনশীলতা ছিল সহজাত স্বভাবধর্ম। কালক্রমে শেষের দিকে সেই গদ্যশৈলী শাণিত বুদ্ধিদীপ্ত ও তির্যক হয়ে উঠেছিল বলে আমাদের মনে হয়।

আবার এই Style প্রসঙ্গে David lodge তাঁর গ্রন্থে বলেছেন—

> "Style as the highest achievement of literature is a little vague, but it is classified else where in the book, and buy a more precise defination. The complete relation of a universal significance in a personal and particular expression. It is an all-inclusive concept of Style in the sense that it takes in everything that we value in literary works of art."[৩]

আমরা ভাষা আলোচনার সূত্র ধরে দেখি উপন্যাসের ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারের দুটি দিক লক্ষ্য করেছি— একটি হল বর্ণনার ভাষা আর অন্যটি সংলাপের বা দ্বিরালাপের ভাষা ইংরেজিতে যাকে 'Dialogue' বলে। 'Dia' শব্দের অর্থ 'দ্বি' এবং 'logue' শব্দের অর্থ 'আলাপ' তাই দ্বিরালাপ। বর্ণনার অংশে লেখকের ভূমিকা থাকে প্রত্যক্ষ এবং সংলাপের অংশে লেখকের ভূমিকা থাকে পরোক্ষ অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়। বর্ণনা অংশে লেখক নিজের অভিজ্ঞতার জবানবন্দি বর্ণনা করে যান, কিন্তু সংলাপ অংশে চরিত্রের কথার মধ্যে যদি লেখক নিজেকে ঢোকাবার চেষ্টা করেন তাহলে সেটা তাঁর অনধিকার প্রবেশ হবে। সংলাপের ভাষার কাঠামো, শব্দের সমাবেশ, অর্থগত বৈশিষ্ট্য এ সবকিছুই চরিত্রের শ্রেণিবৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই লেখক যে ভাষায় বর্ণনা দেন, তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা যদি তাঁর শ্রেণীভুক্ত না হয়, তবে ঠিক তাঁর ভাষাতেই চরিত্রের কথোপকথন রচনা করলে সংলাপের নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিত বিচলিত হয়। তাই বর্ণনার ভাষা এবং সংলাপের ভাষা এক হতে পারেনা। আবার লেখক ও চরিত্র যদি শ্রেণিবিচারে একই পর্যায়ের হলেও বর্ণনা এবং সংলাপের ভাষার মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকাটা বাঞ্ছনীয়। বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখক সরল-জটিল-যৌগিক বাক্য কিংবা হ্যাঁবাচক-নাবাচক-প্রশ্নবাচক ইত্যাদি যে বাক্যই ব্যবহার করেন সবটাই তাঁর নিজের উক্তি। অন্যদিকে সংলাপের ভাষার মধ্যে ভাবান্তরের বিচিত্র উত্থান পতন পরিলক্ষিত হয়। চরিত্রের মনোভাবের জন্যই সংলাপ কোথাও দীর্ঘ, কোথাও হ্রস্ব আবার কোথাও অসমাপ্ত থেকে যায়। তাই সংলাপের বৈশিষ্ট্য মাপকাঠিতে মাপা সম্ভব নয়। কিন্তু এইসব বৈশিষ্ট্য আছে বলেই সংলাপ বা দ্বিরালাপ জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাই বলা যায় যেহেতু বর্ণনা ও সংলাপের কাজ ও স্বভাব এক নয় সেহেতু দুটির ভাষাভঙ্গীর মধ্যে সবসময়ই কিছু না কিছু পার্থক্য অবশ্যই থেকে যায়।

শরৎচন্দ্র সাধারণত উপন্যাসের ভাষার ক্ষেত্রে হঠাৎ করে কোন নতুন রীতির প্রয়োগের চেষ্টা করেননি। বরং পূর্বের প্রথা অনুসারে বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধু ভাষা এবং সংলাপের ক্ষেত্রে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ বলা যায় বিবৃতি রচিত হতো সাধু গদ্য ভাষায় আর চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তি চলিত গদ্য ভাষায় রচনা করে স্বতঃস্ফূর্ত করে তুলতেন। তাঁর সাধু ভাষা যেন চলিত ভাষারই অপর পিঠ, কেননা— তার বর্ণনার গদ্যরূপ ও সংলাপের গদ্যরূপ বাহ্যতঃ বিভিন্ন হলেও আসলে কোন অন্তর্লীন অভিন্ন মৌল কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে। তিনি সাবেক প্রথার অনুসারে বর্ণনার ভাষাকে সংলাপের ভাষার প্রত্যক্ষতা থেকে আলাদা করার জন্য গদ্যের ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপগুলি দীর্ঘতর করেছেন এবং সেই সঙ্গে সংলাপের গদ্যে কথ্যরীতির মৌলিক রূপটি অক্ষুন্ন রেখেছেন। তিনি আসলে সমাজের উপভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন। দেবানন্দপুরে যখন সাহিত্য রচনা করেন তখন সে ভাষায় অবশ্যই রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য বেশি পরিলক্ষিত হয় কিন্তু অন্যদিকে যখন তিনি ভাগলপুরে বসে সাহিত্য রচনা করেছেন তখন সেই ভাষায় অন্য উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়ে। তবে তাঁর ভাষা বাঙালি পাঠকের কাছে সর্বাপেক্ষা পরিচিত ভাষা হয়ে উঠেছে। 'উত্তরকাল ও শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লেখক বলেছেন—

> "শরৎচন্দ্র যেন বাঙালীর মুখের ভাষাতেই উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর রচনায় বৈদগ্ধ্যের দূর্মর আভিজাত্য বা অলংকারের নিবিড় প্রলেপ নেই; এই কারণেই তিনি সর্বাপেক্ষা পরিচিত, সর্বাপেক্ষা সুখপাঠ্য, সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়।"[৪]

শরৎ সাহিত্যে ভাষার জাদুময়ী নিপুনতা, ঘরোয়া সংলাপ ও বর্ণনার স্বাভাবিকতা পাঠকবর্গকে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করেছিল। তার সাহিত্যের ভাষা অলংকার সমৃদ্ধ, বৈদগ্ধপূর্ণ ভাষা নয়। তার ভাষায় সহজ সরল জীবনের মানুষের মনের দাবি প্রাধান্য পেয়েছে। এ ভাষায় স্বচ্ছতা আছে কিন্তু জীবনের তুচ্ছতা নেই। তিনি সাধারণত তার রচনায় বহিরঙ্গ বা কাঠামো রচনা করতেন সাধু গদ্যে আর সংলাপ রচনা করতেন চলিত গদ্যে। তার সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় শ্রেণির মানুষের মুখের ভাষা এমন ভাবে ব্যবহার করেছেন তাতেই যেন নিম্নবর্গীয়

শ্রেণির সামগ্রিক পরিচয় সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় লিখেছেন—

> "প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের স্টাইল এর প্রধান গুন এই যে, এখানে তথাকথিত সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার সমন্বয় হইয়াছে। চলিত ভাষার স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা এবং সাধু ভাষার সমৃদ্ধির মধ্যে তিনি সামঞ্জস্য গঠন করিয়াছেন।"[৫]

আবার শরৎচন্দ্রের ভাষারীতির সহজ স্বতঃস্ফূর্ততা সম্পর্কে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন—

> "এ ভাষার শক্তি এইখানে যে এই অবাধ নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মতো একটানা অগ্রসর হবার ক্ষমতা রাখে। ...শরৎচন্দ্রের গদ্য কখনো বঙ্কিমের মত সংবাদবহ নয়, রবীন্দ্রনাথের মত উচ্চকল্পনাসঞ্চারীও নয়। এর একমাত্র কাজ হল গল্পকে পাঠকের কাছে পরম উপভোগ্য করে তোলা।"[৬]

উপন্যাসের গদ্য ভাষা আলোচনার সময় আমাদের কয়েকটি প্রসঙ্গ মনে রাখতে হয়, সেগুলি হল— বক্তা অর্থাৎ Speaker, শ্রোতা অর্থাৎ Audience এবং ভাষা নিবন্ধন অর্থাৎ Language Register। বক্তা হল যিনি বলছেন এবং শ্রোতা যিনি শুনছেন তা আমরা সকলেই জানি। তাই ভাষা নিবন্ধন বলতে আমরা বুঝি ভাষার আনুষ্ঠানিকতা এবং শৈলীর স্তর— যা শ্রোতা, বিষয় এবং পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। এটি শব্দভাণ্ডার, ব্যাকরণ এবং বাক্য গঠনের পার্থক্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যা নির্দিষ্ট যোগাযোগের চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। অর্থাৎ রেজিস্টার শব্দটি মানুষ কার সাথে কথা বলছে এবং তাদের পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন উপায়ে ভাষা ব্যবহার করে তা বোঝায়। একইভাবে লেখককে চরিত্রের Mental Structure এর ওপর ভাষা ব্যবহার করতে হয়, কেননা লেখকের সকল চরিত্রের মানসিক গঠন বা Mental Structure এক নয়। ফলে ভাষাও এক রকমের হয় না— সে বিষয়টিও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।

ভাষার আলোচনা সূত্রে আমাদের আরও একটি বিষয়ে কিছুটা পর্যালোচনা করা দরকার, সেটি হল Underlexicalization (আন্ডারলেক্সিক্যালাইজেশন), যাকে একটি কৌশল বলতে পারি। যে কৌশলটি রজার ফাউলার দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছিল। Underlexicalization হল— যেখানে একজন লেখক ইচ্ছাকৃতভাবে একটি ধারণা প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট শব্দভাণ্ডারের অভাব ব্যবহার করেন, প্রায়শই একটি নির্দিষ্ট বক্তাকে চিহ্নিত করার জন্য। অর্থাৎ লেখক ইচ্ছাকৃতভাবে এমন একটি শব্দ বাদ দিতে পারেন যা সাধারণত ব্যবহৃত হয়, যার ফলে পাঠকের ওপর শব্দটির অর্থ অনুমান করার ভার পড়ে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে এটি একটি ভাষাগত ঘটনা, যেখানে লেখক কোন আভিধানিক বিষয়কে দমন করে একটি নির্দিষ্ট ধারণা প্রকাশ করতে ব্যবহার করেন। এছাড়া একটি ভিন্ন স্বর বজায় রাখতে বা শব্দ ভান্ডারের শূন্যস্থান পূরণ করতে ব্যবহার করা হয়। Underlexicalization এর পাশাপাশি Overlexicalization (ওভারলেক্সিক্যালাইজেশন) ব্যাপারটিও একটু দেখে নেওয়া যাক। Overlexicalization হল— যখন একটি ধারণাকে বোঝাতে বা একটি নির্দিষ্ট অর্থের ওপর জোর দেওয়ার জন্য প্রচুর সংখ্যক সমার্থক বা আধা-সমার্থক শব্দের ব্যবহার করা হয় তখন তাকে আমরা Overlexicalization বলি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখকরা একটি নির্দিষ্ট প্রভাব তৈরি করতে এর ব্যবহার করে থাকেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় একটি চরিত্রের তীব্র মানসিক অবস্থার বর্ণনায় ব্যবহার করে থাকেন। অর্থাৎ আমরা Overlexicalization বলতে, যেখানে বলার মাত্রাটা অনেক বেশি কিন্তু তার সারাংশ খুঁজলে তার সারবত্তা খুব ছোট হয়ে দাঁড়ায় সেটাকেই বুঝি।

এখন আমরা দেখব শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের মধ্যে কিভাবে নিম্নবর্গের মানুষের মুখের ভাষা সাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছে। প্রথমেই আসি 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে নিম্নবর্গের ভাষা নিয়ে। গল্পে কাঙালীর মা অভাগী যখন বলে—

> "দ্যাখ দ্যাখ বাবা, বামুন-মা ওই রথে চড়ে সগ্যে যাচ্ছে।"[৭] তখন এখানে আমরা দেখি 'দ্যাখ' শব্দটির মধ্যে 'এ' ধ্বনিটি 'অ্যা' ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়েছে, যা বঙ্গালি উপভাষার বৈশিষ্ট্য। এছাড়া 'বামুন' ও 'সগ্যে' এই দুটি শব্দ এখানে তলভাষী (Basilect) শব্দ যা নিম্নবর্গের মানুষের মুখের শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও দেখি অভাগী যখন বলে— "কাঁদবো কিসের জন্যে রে! — চোখে ধোঁ লেগেছে বৈ ত নয়!"[৮]

এখানে দেখা যায় 'ধোঁ' শব্দটি চলিত গ্রাম্য শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি 'বৈ' 'ত' ইত্যাদি অব্যয় পদের সুব্যবহার নিম্নবর্গীয় শ্রেণির ভাষাকে জীবন্ত করে তুলেছে। আবার অভাগী যখন বলে— "আমি যে দেখনু কাঙালী, বামুন-মা রথের উপরে বসে। তেনার রাঙা পা-দুখানি যে সবাই চোখ মেলে দেখলে রে।"[৯] অর্থাৎ এখানেও আমরা দেখি 'দেখনু' শব্দটির মধ্যে রাঢ়ী উপভাষার প্রান্তিক বিভাষার বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, যা নিম্নবর্গের ভাষা হয়ে উঠেছে।

'বিলাসী' গল্পের মধ্যেও কিভাবে ভাষা ব্যবহার করে নিম্নবর্গের চিত্র ফুটে উঠেছে সেটাই দেখার বিষয়। জ্ঞাতি খুড়া যখন বলে—

> "অকালকুষ্মাণ্ডটা একটা সাপুড়ের মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক, তাহার হাতে ভাত পর্যন্ত খাইতেছে।"[১০]

অর্থাৎ এখানে দেখি 'আছ' ধাতু যোগে 'আনিয়াছে', 'খাইতেছে' প্রভৃতি শব্দ যোগ করেছে যা রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া 'নিকা' একটি আরবি শব্দ যাকে লেখক ব্যবহার করেছেন। ফলে এর মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের ছবি ফুটে উঠেছে। আবার দেখি বিলাসী যখন বলে—"ঠাকুর, একটু সাবধানে খুড়ো। সাপ একটা নয়, একজোড়া ত আছে বটেই, হয়ত বা বেশীও থাকতে পারে।"[১১] অর্থাৎ এখানে ঝাড়খন্ডি উপভাষার বৈশিষ্ট্য হিসাবে 'বট' ধাতুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ফলে নিম্নবর্গের মুখের ভাষা যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

'মহেশ' গল্পের মধ্যে লেখক কিভাবে নিম্নবর্গের মানুষের মুখে ভাষা ব্যবহার করেছেন সেটাই এখন দেখব। গফুর যখন তর্করত্নকে বলে—

> "কোথায় ছাড়বো বাবাঠাকুর, লোকের ধান এখনো সব ঝাড়া হয়নি— খামারে পড়ে; খড় এখনো গাদি দেওয়া হয়নি, মাঠের আলগুলো সব জ্বলে গেল— কোথাও একমুঠো ঘাস নেই। কার ধানে মুখ দেবে, কার গাদা ফেড়ে খাবে— ক্যামনে ছাড়ি বাবাঠাকুর?"[১২]

অর্থাৎ এখানে দেখি 'ক্যামন' শব্দটির মধ্যে 'এ' ধ্বনি 'অ্যা' ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়েছে যা বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্য, সেটাই নিম্নবর্গের মুখের ভাষা হয়ে উঠেছে। তাছাড়া আরোও দেখি গফুর যখন তার মেয়ে আমিনাকে বলে—

> "ওসব থাক মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।"[১৩]

এখানেও দেখা যায় 'প্রাচিত্তির' শব্দটি একটি লোকশব্দ হিসাবে পরিচিত যা গফুরের মুখে বসিয়ে তাকে যেন নিম্নবর্গের জীবন্ত চরিত্র করে তুলেছে। আবার গল্পের শেষে গিয়ে দেখি গফুর যখন বলে—

> "আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চ'রে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না।"[১৪]

অর্থাৎ এখানেও আমরা দেখি 'আল্লা', 'কসুর' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন যা সাধারণত মুসলমানী বাংলা বলে পরিচিত। ফলে বোঝা যায় গফুর একজন নিম্নবর্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। তাছাড়া এ বাক্যের মধ্য দিয়ে শুধুই বিধির দিকে বিচার চেয়ে নালিশ জানানো হয়েছে, যার মাধ্যমে নিম্নবর্গের চরিত্রটি আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে আলোচ্য গল্পের মধ্যে। ফলে আমরা আমাদের পর্যালোচনায় তুলে ধরেছি।

'মন্দির' গল্পের মধ্যেও আমরা নিম্নবর্গের মানুষের মুখের ভাষা হিসাবে কুমোর বাড়ির সরকারদাদা যখন শক্তিনাথকে বলে—

> "নাও দাদাঠাকুর, তুমি চিত্তির কর।"[১৫]

এখানে আমরা দেখি 'চিত্তির' শব্দটি লোকশব্দ হিসেবে পরিচিত যা লেখক নিম্নবর্গের চরিত্রটির মুখের ভাষা হিসাবে ব্যবহার করে চরিত্রটিকে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলেছেন। ফলে আমরা আমাদের পর্যালোচনায় তুলে ধরেছি।

'হরিচরণ' গল্পের মধ্যেও আমরা দেখি নিম্নবর্গের ছেলে হরিচরণের মুখের ভাষা, সে যখন বলে—

> "মা, আমরা গরিব লোক, চিরকাল খাটতেই হবে, আর বসে থেকেই বা কি হবে"[১৬]

অর্থাৎ এখানে 'খাটতেই' এবং 'থেকেই' শব্দ দুটিতে অন্তস্বরাগমের মধ্য দিয়ে মেনে নেওয়ার ব্যাপারটি প্রাধান্য পেয়েছে। যা নিম্নবর্গের মানুষের মুখের ভাষার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ফলে চরিত্রটি আরো জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাই আমরা বিষয়টি তুলে ধরেছি।

এতক্ষণ আমরা শরৎচন্দ্রের গল্পের মধ্যে থাকা নিম্নবর্গীয় শ্রেণির ভাষা-সংলাপ এর কথা পর্যালোচনা করলাম। এখন আমরা দেখব তার উপন্যাসগুলির মধ্যে নিম্নবর্গের ভাষা কিভাবে ফুটে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে 'উপন্যাসের ভাষাশিল্প ও শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধে পবিত্র সরকার মহাশয় বলেছেন—

> "গল্প উপন্যাসের চরিত্র আঁকতে গিয়ে লেখকেরা নানা উপায় বেছে নেন। উদ্দেশ্য চরিত্রটিকে কমবেশি জ্যান্ত করে পাঠকদের সামনে ছেড়ে দেওয়া— যেন তারা নিজেদেরই একটা প্রাণ উপার্জন করে।"[১৭]

অর্থাৎ লেখক চরিত্রকে জ্যান্ত করেন তার মুখে সঠিক ভাষা-সংলাপ বসিয়ে।

'বিরাজ বৌ' উপন্যাসে আমরা দেখি নিম্নবর্গের মানুষ হিসাবে মতি চাঁড়ালের মুখের ভাষা। সে যখন বলে—

> "দাঠাকুর, তুমি একবার না দেখলে ত আমার ছিমন্ত আর বাঁচে না! একবার পায়ের ধুলো দাও দেবতা, তাহলে যদি এ-যাত্রা সে বেঁচে—।"[১৮]

এখানে 'ছিমন্ত' শব্দটি তলভাষী শব্দ যা সমাজের নিচু তলার মানুষের মুখে শোনা যায়। লেখক এখানে নিম্নবর্গের চরিত্র মতি চাঁড়ালের মুখে শব্দটি বসিয়ে চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। আবার আরও দেখি মতি চাঁড়াল চোখ মুছতে মুছতে যখন বলে—

> "সে আর কি বলব! মা যেন একেবারে ঢেলে দিয়েচেন। ছোটজাত হয়ে জন্মেচি ঠাকুদ্দা, কিছুই ত জানিনে কি করতে হয়— একবার চল, বলিয়া ছে দু'পা জড়াইয়া ধরিল।"[১৯]

অর্থাৎ এই ভাষার মধ্যে দেখি 'দিয়েচেন', 'জন্মেচি' এই দুটি শব্দ অল্পপ্রাণ হয়ে উচ্চারিত হয়েছে, যা রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছে। তাছাড়া 'ঠাকুদ্দা' শব্দটিতেও আমরা ব্যঞ্জনদ্বিত্ব এর প্রয়োগ লক্ষ্য করেছি, যা রাঢ়ী উপভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। যার ফলে নিম্নবর্গের ভাষা জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে বলে আমাদের মনে হয়েছে।

'পন্ডিতমশাই' উপন্যাসের মধ্যেও আমরা নিম্নবর্গীয় শ্রেণির চরিত্র হিসাবে বৃন্দাবনকে পাই। বৃন্দাবনের ছেলে চরণ যখন ভেদবমি করে অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন গোপাল ডাক্তারকে ডাকতে গিয়ে বৃন্দাবন বলে—

> "ঘাট মানচি, পায়ের ধূলো মাথায় নিচ্চি ডাক্তারবাবু, একবার চলুন! শিশুর প্রাণ বাঁচান। এক শ টাকা দেবো— দু'শ টাকা, পাঁচ শ টাকা— যা চান দেবো ডাক্তারবাবু, চলুন— ওষুধ দিন।"[২০]

অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাই কত সহজ সুন্দরভাবে ডাক্তারকে যাওয়ার জন্য বলছে বৃন্দাবন নিজে হীনতা স্বীকার করছে যা নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে দেখা যায়। সেটাই লেখক তার মুখের ভাষার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন আর তাতেই যেন চরিত্রটি উপন্যাসে প্রাণ পেয়েছে বলে আমাদের মনে হয়।

এছাড়া আরও দেখি যখন চরণ মারা যাওয়ার পর বৃন্দাবন ও কুসুম ফিরে এসেছে তারপর কুসুমকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বৃন্দাবন বলছে—

> "চরণকে যে তুমি কত ভালবাসতে তা আমি জানি কুসুম। তাই তোমাকেও এ পথে ডাকছি। সে তোমার মরেনি, হারায়নি, শুধু লুকিয়ে আছে— একবার ভালো করে চেয়ে দেখতে শিখলেই দেখতে পাবে, যেখানে যত ছেলেমেয়ে আছে, আমাদের চরণও তাদের সঙ্গে আছে।"[২১]

অর্থাৎ এখানে দেখি কত সুন্দর ভাবে জটিল ও যৌগিক বাক্য দিয়ে বর্ণনাটি সহজ চলিত গদ্যে সাধারণ শব্দ দিয়ে জীবন দর্শনের ব্যঞ্জনা দিয়েছেন; যা সত্যিই নিম্নবর্গের মুখের ভাষা হয়ে উঠেছে। এসব ভাষা দেখে পাঠকবর্গকে বিস্মিত হতে হয়।

আবার উপন্যাসে যখন কুঞ্জের স্ত্রী ব্রজেশ্বরীর মা কুসুমকে উদ্দেশ্য করে বলে—

> "তা ছাড়া এই পরের মেয়েটি কি পর্দার বিবি, নাকি কারুর সামনে বার হন না? ওলো, ও যেমন করে বার হতে জানে, তা দেখলে আমাদের বুড়ো মাগীদের পর্যন্ত লজ্জা হয়।"[২২]

এখানে এই যে 'ওলো' শব্দের ব্যবহার লেখক করেছেন যাকে আমরা সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে লিঙ্গোপভাষা (Genderlect) বলতে পারি। এ সকল শব্দ সাধারণত গ্রাম্য মেয়েদের মুখেই শোনা যায় ফলে এটিকে আমরা মেয়েলি ভাষাও বলতে পারি। তাছাড়া 'মাগী' শব্দটি লেখক অনায়াসে ব্যবহার করেছেন। কেননা সেকালের দিনে 'মাগী' শব্দটি সাধারণত সচরাচর শব্দ বা চল শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেকালের দিনে অনায়াসেই এই 'মাগী' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। ফলে শব্দটি আমাদের কাছে এখন দৃষ্টিকটু হলেও তখনকার দিনে শব্দটির চল ছিল। কিন্তু এখনকার দিনে 'মাগী' শব্দটি প্রয়োগ করলে তা গ্রাম্য বদকথা (Slang) বলে ধরা হত। তাই লেখক নিম্নবর্গের চরিত্রটির জীবন্ত রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আবার যখন বৃন্দাবন তার ছেলের জন্য ওষুধ আনতে যায় তখন ওষুধ না দিলে বৃন্দাবনের কান্না শুনে তারিণীর স্ত্রী এসে তারিণীকে বলতে বলে গোপালকে ওষুধ দেওয়ার জন্য তখন—

> "তারিণী খিঁচাইয়া উঠিল— তুই থাম মাগী! পুরুষ মানুষের কথায় কথা কস নে।"[২৩]

অর্থাৎ এখানেও আমরা চল শব্দ হিসাবে 'মাগী' শব্দটি পাই। সেই সঙ্গে 'খিঁচাইয়া' শব্দটি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গ্রাম্যতার ভাব ও ফুটে উঠেছে যার অর্থ দাঁত চিপে কথা বলা। ফলে এসবের মধ্য দিয়েই চরিত্রগুলি আরো বাস্তবসম্মত হয়ে ধরা পড়েছে আমাদের কাছে। এখানে লেখক চরিত্রের মুখে চলিত গদ্যের দ্বিরালাপ (Dialogue) ব্যবহার করে জীবনের নিগূঢ় সত্যকে তুলে ধরেছেন এ কথা আমরা বলতে পারি।

অধ্যাপক শ্যামলচন্দ্র দাস তার একটি প্রবন্ধে 'পন্ডিতমশাই' উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন—

> "ধরে নেওয়া যায় ব্যান্ডেল, বৈদ্যবাটি, দেবানন্দপুর এলাকার মৌখিক ভাষা সেকালেও ছিল, এমনকি একালেও আছে— কেন্দ্রিয় রাঢ়ী উপভাষা বা মান্য চলতি বাংলা। যা আলোচ্য উপন্যাসের চরিত্রগুলির সংলাপের ভাষা। কাজেই, এ ভাষার বাস্তবসম্মত প্রয়োগের সাফল্য সহজেই এসেছে।"[২৪]

এরপর আমরা 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের মধ্যে থাকা চরিত্রের মুখের দ্বিরালাপ (Dialogue) নানাভাবে পর্যালোচনা করেছি। উপন্যাসের চার নং পরিচ্ছেদে দেখি পৌঢ়া রমনী ক্ষ্যেন্তি বামনির মেয়ে যখন গোবিন্দ গাঙ্গুলিকে দেখিয়ে বলে—

> "ঐ উনি মুখুয্যে বাড়ির গাছ পিতিষ্ঠের সময় জরিমানা বলে ইস্কুলের নামে দশ টাকা আমার কাছে আদায় করেন নি কি? গাঁয়ের ষোল আনা শেতলা-পুজোর জন্যে দু-জোড়া পাঁঠার দাম ধরে নেন নি কি? তবে? কতবার ঐ এককথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চান শুনি?"[২৫]

অর্থাৎ এখানে আমরা গ্রামীণ পৌঢ়া অর্থাৎ বৃদ্ধার মুখের ভাষা হিসাবে 'পিতিষ্ঠে', 'শেতলা' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই। যে শব্দগুলিকে আমরা তলভাষী (Basilect) শব্দ বলেছি কেননা সমাজের একদম নিচুস্তরের মানুষের মুখের ভাষাকে তলভাষী বলা হয়। আবার 'ইস্কুল' শব্দটির মধ্যে আদি স্বরাগমের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই সকল শব্দ ব্যবহার করে লেখক চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। আবার উপন্যাসের এগার নং পরিচ্ছেদে দেখি যখন নিম্নবর্গের কৃষকরা এসে রমেশকে বলে—

> "ছোটবাবু এ যাত্রা রক্ষা করুন, আপনি না বাঁচালে ছেলেপুলের হাত ধরে আমাদের পথে ভিক্ষে করতে হবে।"[২৬]

অর্থাৎ এখানে দেখি লেখক খুব সহজ চলিত মুখের ভাষাকে লিখিত ভাষার রূপ দিয়েছেন। যার ফলে নিম্নবর্গের মানুষের করুন আর্তনাদ খুব সহজেই ধরা পড়েছে। 'বাবু' সম্বোধন পদ ব্যবহার করে লেখক এখানে নিম্নবর্গের ভাষাকে জীবন্ত করে তুলেছেন বলে আমাদের মনে হয়েছে।

আবার লেখক যখন আকবরের মুখে দ্বিরালাপ (Dialogue) বসিয়েছেন তখন দেখি সে ভাষা 'মুসলমানী বাংলা' ভাষার পরিচয় বহন করে। আকবর যখন বলে—

> "হাঁ— মায়ের দুধ খেয়েছিল বটে ছোটবাবু! লাঠি ধরলে বটে! ...মুই সেলাম করে কইলাম, আল্লার কিরে ছোটবাবু, তুমি একটিবার পথ ছাড়। তোমার আড়ালে দাঁড়িয়ে এ যে ক'সম্মুন্দি মুয়ে কাপড় জড়ায়ে ঝপাঝপ কোদাল মারচে, ওদের মুন্ডু কটা ফাঁক করে দিয়ে যাই!"[২৭]

অর্থাৎ এখানে আমরা 'আল্লা', 'সেলাম' প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক ভাষা খুঁজে পেয়েছি যার মাধ্যমে মুসলমান চরিত্রটি ফুটে উঠেছে। এছাড়া এখানে 'বট' ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায় যা ঝাড়খন্ডি উপভাষার বৈশিষ্ট্য। আরও দেখি 'মুই' চলিত সর্বনাম পদের ব্যবহার এবং 'কইলাম' চলিত ক্রিয়াপদ এর ব্যবহারে চলিত কথ্য ভাষাকে লেখক চলিত লেখ্য ভাষায় তুলে ধরেছেন। যার ফলস্বরূপ নিম্নবর্গের সমাজকে পাঠকের কাছে প্রত্যক্ষ করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন বলে মনে করেছি।

'পল্লীসমাজ' উপন্যাস প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্যামলচন্দ্র দাস মহাশয় বলেন—

> "পল্লীসমাজ উপন্যাস হয়ে ওঠে নানা ভাষার সুডৌলাধার। বিবিধ ভাষার সহাবস্থানে কোন বিরোধ নেই। ফলে এই উপন্যাসের ভাষা-পরিবেশ হয়ে ওঠে পাঠকের মানসিক বিচরণের গণ্ডিহীন নানা ভাষা বদল (Languages Shift)-এর অনন্য প্রন্যাস (System)।"[২৮]

এই সুযোগে এখানে আমরা লেখকের ব্যবহৃত বদকথা (Slang) প্রসঙ্গটি আলোচনা করে নিতে পারি। এই বদকথাকে উপভাষায় কথা বলা মানুষদের subcultural form এর একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবে ধরা হয়।

আমরা প্রথমেই 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের মধ্যে দেখি নিম্নবর্গের মানুষকে শাসন করার জন্য যখন জমিদারের দারোয়ান কাঙালীর বাবা রসিককে বলে—

> "শালা, একি তোর বাপের গাছ আছে যে কাটতে লেগেছিস।"[২৯]

অর্থাৎ এখানে আমরা দেখি নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি অবজ্ঞার ভাষা হিসাবে 'শালা' শব্দটি যা বদকথা (Slang) হিসাবে প্রচলিত তা ব্যবহার করে নিম্নবর্গের স্থান সমাজে কোথায় সেটা ফুটিয়ে তুলেছেন।

আবার 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে গোবিন্দ গাঙ্গুলী যখন বলে—

> "তবে রে হারামজাদি মাগী—"[৩০]

কিংবা পরান হালদার যখন বলে—

> "এই বেশ্যে মাগীদের বাড়ি থেকে একেবারে তাড়িয়ে না দিলে এখানে আমি জলগ্রহণ করব না তা বলে দিচ্চি। ...এমন সব খানকী নটির কান্ডকারখানা জানলে কি জাতজন্ম খোয়াতে এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়াই?"[৩১]

অর্থাৎ এখানে লেখক চরিত্রের মুখে 'হারামজাদি', 'বেশ্যে', 'খানকী' প্রভৃতি শব্দগুলি নির্দ্বিধায় ব্যবহার করেছেন যা বদকথা (Slang) হিসাবে পরিচিত। যার ফলে চরিত্রগুলি যেন উপন্যাসে বাস্তব রূপ পেয়েছে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়া 'শ্রীকান্ত'(প্রথম পর্ব) উপন্যাসের মধ্যে দেখি লেখক ইন্দ্রনাথের মুখের ভাষার মধ্যে বদকথা (Slang) বসিয়েছেন। সে যখন বলে—

> "জোচ্চোর শালাদের ছায়া মাড়াতে নেই। হারামজাদা বজ্জাত ব্যাটারা।"[৩২]

তখন এ ভাষার মধ্যে 'জোচ্চোর', 'শালা', 'হারামজাদা' প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহার করেন যেগুলিকে আমাদের বদকথা (Slang) বলেই মনে হয়েছে। যার মাধ্যমে লেখক ইন্দ্রনাথ চরিত্রের যথাযথ রূপ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে সে দিক থেকে আমরা আমাদের পর্যালোচনায় তুলে ধরেছি।

'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব) উপন্যাসের মধ্যে আমরা নিম্নবর্গীয় চরিত্র হিসাবে শাহজী ও অন্নদাদিদিকে পাই। অন্নদাদিদি যখন ইন্দ্রনাথকে বলে—

> "আমাদের আগাগোড়া সমস্ত ফাঁকি। আর তুমি মিথ্যে আশা নিয়ে শাহজীর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়িয়োনা। আমরা তন্ত্রমন্ত্র কিছুই জানিনে, মড়াও বাঁচাতে পারিনে; কড়ি চেলে সাপ ধরে আনতেও পারিনে। আর কেউ পারে কি না জানিনে, কিন্তু আমাদের কোন ক্ষমতাই নেই। ...আমরা যে সাপুড়ে— ভাই, ঠকানোই যে আমাদের ব্যবসা।"[৩৩]

অর্থাৎ এখানে আমরা অন্নদাদিদির মুখের ভাষার দ্বিরালাপের মধ্য দিয়ে তার সহজ, সরল, নির্ভেজাল নারী চরিত্রকে খুঁজে পাই। লেখক এখানেও চলিত কথ্য ভাষাকেই লেখ্য ভাষায় স্থান দিয়ে নিম্নবর্গের চরিত্রকে অনন্য করে তুলেছেন।

'শ্রীকান্ত' (দ্বিতীয় পর্ব) উপন্যাসে নন্দ মিস্ত্রি ও টগরের দ্বিরালাপে আমরা তাদের ভাষার মধ্যেই বুঝতে পারি তারা কোন শ্রেণির মানুষ। টগর যখন বলে—

> "পরিবার! আমার সাত পাকের সোয়ামী বলচেন, পরিবার! খবরদার বলচি মিস্তিরী, যার-তার কাছে মিছে কথা বলে আমার বদনাম করো না বলে দিচ্চি। ...বিশ বচ্ছর ঘর করচি বটে, কিন্তু একদিনের তরে হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েচি?"[৩৪]

অর্থাৎ এখানে দেখি লেখক ইচ্ছে করেই টগরের মুখ দিয়ে 'সোয়ামী', 'মিস্তিরী' প্রভৃতি শব্দগুলি বসিয়েছেন যা মূলত তলভাষী (Basilect) শব্দ। যার ফলে নিম্নবর্গের চরিত্রটি যথাযথভাবে বাস্তবসম্মত হয়ে উঠেছে। তাছাড়া এখানেও 'বট' ধাতুর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় যাকে আমরা ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্য বলে মনে করি। ফলে লেখক এখানে সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে দরিদ্র শ্রেণির নারীর মুখের ভাষা প্রয়োগ করে নিম্নবর্গের নারীর ভাষাকে ফুটিয়ে তুলেছেন বলে আমরা মনে করি।

আবার যখন আমরা নিম্নবর্গীয় পুরুষ চরিত্রের মুখের ভাষা শুনি তখনও হতবাক হয়ে যায়। নন্দ মিস্ত্রী যখন বলে—

"দেখলেন মশাই, মাগীর ছোট মন? কে বাঙ্গালী মেয়েটা রেঙ্গুনে যাচ্ছে— খবরটা নিতেও দোষ? ...তোর কি আমি পেষা বাঁদর যে, যে-দিকে শেকল ধরে নিয়ে যাবি সেই দিকে যাব? আমার ইচ্ছে হলে আবার গিয়ে বেচারাকে দেখে আসব— তুই যা পারিস, তা করিস।"[৩৫]

অর্থাৎ এখানে আমরা একজন নিম্নবর্গীয় পুরুষ চরিত্রের মনোবৃত্তি বুঝতে পারি যে, নন্দ কারো পরোয়া করে না, তার যা ইচ্ছে হবে সেটাই করবে। আসলে নিম্নবর্গের পরিবারের গতিবিধি লেখক নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন ভাষার মাধ্যমে। কেননা পুরুষ যেমন স্ত্রীকে খুব বেশি পাত্তা দেয় না তেমনি স্ত্রীরাও কিন্তু স্বামীর কথার বাইরে যায় না এমন নয়। ফলে দুদিক থেকেই আমরা নিম্নবর্গের পরিবারের চিত্র খুজে পেয়েছি। এছাড়া তাদের মুখের ভাষা তাদের পরিচয় বহন করেছে অনেকটা। যেমন— 'মাগী' শব্দটি লেখক নিম্নবর্গের চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহার করেছেন। যদিও শব্দটি তখনকার দিনে 'চল' শব্দ হিসাবে ধরা হতো। ফলে সবদিক দিয়েই লেখক যেন চরিত্রের জীবন্ত রূপ তুলে ধরেছেন এমন ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে।

এছাড়াও উপন্যাসের চৌদ্দ নং পরিচ্ছেদে যখন আমরা রতনের মুখের ভাষা শুনি, সে যখন বলে—

"আমার অন্যায় হয়ে গেছে বাবু, মোচলমান কুলিতে খাবারটা ছুয়ে ফেলেচে, কত বলচি, মা ইস্টিশান থেকে কিছু কিনে এনে দিই কিন্তু কিছুতেই না।"[৩৬]

অর্থাৎ এখানে আমরা রতনের ভাষায় 'ইস্টিশান' শব্দটিতে দেখি আদি স্বরাগম ঘটেছে। আর 'মোচলমান' শব্দটি এখানে একটি তলভাষী (Basilect) শব্দ হিসাবে উচ্চারিত হয়েছে। যার ফলে চরিত্রটি তার মুখের ভাষার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে তাই আমরা আমাদের পর্যালোচনায় তুলে ধরেছি।

'শ্রীকান্ত' (তৃতীয় পর্ব) উপন্যাসে পাঁচ নং পরিচ্ছেদে দেখি মধুডোম নিম্নবর্গীয় জাতির মানুষ। তার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে সে এসে যখন বলে—

"হুজুর, পহর রেতের মধ্যেই লগন, একবার যদি পায়ের ধূলো দেন।"[৩৭]

অর্থাৎ এখানে আমরা 'পহর' এবং 'লগন'এই দুটি শব্দের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারি যে মধুডোম একজন নিম্নবর্গীয় পরিবারের গ্রামের বৃদ্ধ মানুষ হবে। কেননা 'পহর' ও 'লগন' শব্দ দুটি তলভাষী (Basilect) শব্দ হিসেবে বেশি ব্যবহৃত হয়। ফলে লেখক ওই ডোম পরিবারের মানুষের মুখের কথ্য ভাষাকেই এনে লেখ্য ভাষায় স্থান দিয়েছেন। যার ফলস্বরূপ চরিত্রটি আরো জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। আবার ধ্বনি পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় 'পহর' শব্দটির মধ্যে মধ্যব্যঞ্জন লোপ ঘটেছে। ঠিক তেমনি 'লগন' শব্দটিতেও মধ্যস্বরাগম ঘটেছে। ছিল 'লগ্+ন', আর হয়েছে 'ল+গন্'।

আবার উপন্যাসের এগার নং পরিচ্ছেদে দিয়ে সতীশ ভরদ্বাজ এর প্রণয়িনী হিসাবে আমরা একটি বাউরি জাতির মেয়েকে পাই, যার নাম কালিদাসী। তার মুখের ভাষায় দেখি সে যখন বলে—

"হেথকে। উ কি বাঁচবেক্! ...কাপড় নেই পেণ্টুলুন আছে।"[৩৮]

অর্থাৎ এখানে আমরা 'বাঁচবেক' শব্দটির মধ্যে ক্রিয়াপদে স্বার্থিক 'ক' প্রত্যায়ের ব্যবহার লক্ষ্য করেছি, যা ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিচিত। তাছাড়া আগেকার দিনে যে 'পেণ্টুলুন' শব্দের প্রয়োগ ছিল তা বুঝতে পারি; যার অর্থ পায়জামা। গ্রামের বৃদ্ধ বৃদ্ধারা এখনও অনেকে এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। যেটিকে আমরা তলভাষী (Basilect) শব্দ হিসাবে তুলে ধরেছি। যার ফলে চরিত্রটি নিম্নবর্গীয় শ্রেণির মানুষ হিসাবে ফুটে উঠেছে।

'দেবদাস' উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখি যখন পার্বতী বলে তাকে পন্ডিতমশাই মেরেছে, তখন পার্বতীর পিতামহী বলেন—

> "নারান, দেখ ত মিনষের আস্পর্ধা! শুদ্দুর হয়ে বামুনের মেয়ের গায়ে হাত তোলে! কি করে মেরেচে একবার দেখ।"[৩৯]

অর্থাৎ এখানে আমরা 'মিনষে' শব্দটিকে সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে লিঙ্গপোভাষা (Genderlect) বলে থাকি; তাছাড়া শব্দটিকে লিঙ্গভেদে মেয়েলি ভাষা বলা হয়। আবার 'আস্পর্ধা' শব্দটির মধ্যে দেখি আদি স্বরাগম ঘটেছে। এছাড়াও 'শুদ্দুর' শব্দটি ধ্বনিগত পরিবর্তনের দিক থেকে দেখি মধ্য স্বরাগম ঘটেছে আবার 'শুদ্দুর' শব্দটিকে আমরা তলভাষী (Basilect) শব্দ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি, কেননা শব্দটি গ্রাম্য সমাজের মানুষদের মধ্যেই বেশি ব্যবহার হতে দেখা যায়। ফলে সবদিক থেকেই এ ভাষা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে বলে আমাদের মনে হয়।

আবার উপন্যাসের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে দেখি যখন চন্দ্রমুখী ভৈরব গয়লাকে তালসোনাপুর গ্রাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন ভৈরব গয়লা বলে—

> "হাঁ তিনি মুলুকের জমিদার। এ গাঁও তাঁর। আজ তিন বছর হল তিনি স্বর্গে গিয়েছেন; যত প্রজা একমাস ধরে সেখানে নুচিমণ্ডা খেয়েছিল। এখন তার দুই ছেলে আছে, মস্ত বড়লোক— রাজা।"[৪০]

অর্থাৎ এখানেও আমরা সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে এ ভাষা অর্থনৈতিক ভেদে দরিদ্র শ্রেণির মানুষের মুখের ভাষা হিসাবে স্থান পেয়েছে। আবার অন্যদিকে 'নুচিমণ্ডা' শব্দটির মধ্যে আমরা উপভাষাগত দিক থেকে দেখি 'ল' ধ্বনিটি 'ন' ধ্বনিতে পরিণত হয়ে উচ্চারিত হয়েছে; যা রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরা পড়েছে। ফলে নিম্নবর্গের চরিত্র হিসাবে গয়লা জাতির মানুষটির মুখের ভাষাকেই লেখক লেখ্য ভাষায় ব্যবহার করে চরিত্রটিকে বাস্তবসম্মত রূপ দিয়েছেন।

এছাড়াও এই উপন্যাসের ষোড়শ পরিচ্ছেদে দেখি যখন দেবদাস পান্ডুয়া স্টেশনে নেমে গরুর গাড়িতে করে হাতিপোতায় নিয়ে যেতে বলে তখন গাড়োয়ানের যে মুখের ভাষা, তিনি বলেন—

> "এখনো আট-দশ কোশ আছে বাবু।"[৪১]

অর্থাৎ এখানে ধ্বনিগত পরিবর্তনের দিক থেকে কোশ শব্দে দেখি 'র' লোপ পেয়েছে। আবার অন্যদিকে দেখি যেহেতু হুগলি জেলার পান্ডুয়া স্টেশন হলে তা রাঢী উপভাষার নিম্নবর্গের মানুষের কথ্য ভাষাকে লেখক এখানে ব্যবহার করেছেন ফলে আমরা আমাদের পর্যালোচনায় তুলে ধরেছি।

আবার সবশেষে দেখি যখন দেবদাস হাতিপোতার জমিদারের বাড়ির সামনে অশ্বত্থ গাছতলায় মরে পড়ে আছে, সে খবর গোটা গ্রামে ছড়িয়েছে তখন পার্বতী এক দাসীকে জিজ্ঞাসা করে বলে—

> "কি হয়েচে লা? কে মেরেচে?"[৪২]

অর্থাৎ এখানেও আমরা সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে লিঙ্গভেদে দেখি 'লা' শব্দটি শুধুমাত্র নারীরই মুখের ভাষায় স্থান পায়। ফলে এ ভাষা বাস্তবসম্মত মেয়েলি ভাষা হয়ে উঠেছে। তাই সব দিক থেকে পর্যালোচনা করে বলা যায় বিভিন্ন চরিত্রের মুখে বিভিন্ন রকম শব্দ বসিয়ে লেখক যেন চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসের মধ্যে আট নং পরিচ্ছেদে দেখি যখন সতীশ বিহারীকে বলে সাবিত্রী আহ্নিক কেন করছে, তখন বেহারী বলে—

> "আজ্ঞে, তিনি ত রোজ করে। একাদশীর দিনে এক ফোঁটা জলও খায় না। আমরা কত বলি বাবু, কিন্তু তিনি মাছও খায় না, রাত্তিরেও খায় না— ভদ্দরনোক কিনা তাই।"[৪৩]

এখানে আমরা সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে 'আজ্ঞে' শব্দটিকে অর্থগত দিক থেকে দেখি দুর্বল শ্রেণির মানুষের মুখের ভাষা। আবার 'ভদ্দরনোক' শব্দটির মধ্যে 'ল' ধ্বনি 'ন' ধ্বনিতে পরিণত হয়ে উচ্চারিত হয়েছে;

যা রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য হিসাবে চোখে পড়ে। সেইসঙ্গে 'রাত্তির' শব্দটিতেও দেখি ব্যঞ্জনদ্বিত্ব হয়ে উচ্চারিত হয়েছে— সেটাও রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য।

এছাড়া মোক্ষদার পরিচয় পাই এই পরিচ্ছেদেই, যে সতীশের পশ্চিমের বাড়িতে দাসীর কাজ করতো অনেকদিন আগে। কিন্তু এখন বর্তমানে সতীশকে মোক্ষদা তার নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছে তখন সতীশ ভুবনচন্দ্র মুখুয্যের কথা জিজ্ঞাসা করলে মোক্ষদা বলে—

> "না, মারা যাননি, কিন্তু গেলেই ছিল ভাল। তিনি বামুন মানুষ, বর্ণের গুরু, আমাদের মাথার মনি, নারায়ণতুল্য। তাঁকে অভক্তি করছি নে, তাঁর চরণের ধুলো নিচ্চি; কিন্তু কোনদিন দেখা পেলে তিনটি ঝ্যাঁটা মুখে গুনে মারব, তবে আমার নাম মোক্ষদা। ... তিনি মানুষ নয়, চামার।"[৪৪]

অর্থাৎ এখানে দেখি 'ঝ্যাঁটা' শব্দটির মধ্যে 'আ' ধ্বনি 'অ্যা' হয়ে উচ্চারিত হয়েছে, যা বঙ্গালি উপভাষার বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা যায়। তাছাড়া 'চামার' শব্দের ব্যবহারে মূলত 'Downword mobility' দেখা যায়। যেখানে পেশাগত দিক থেকে সে দাসী ফলে নিম্নবর্গের নারীর মুখের কথ্য ভাষা দিয়েই লেখক তাকে যথার্থ রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন।

আবার উপন্যাসের শেষের দিকে তেতাল্লিশ নং পরিচ্ছেদে আমরা বাড়িউলীর মুখের ভাষা পাই, সে যখন কিরণময়ীকে বলে—

> "ভাল কথা মনে পড়েছে বৌমা, খোট্টা মিনসেকে ত সকালেই খবর পাঠিয়েছিলুম। ব্যাটার আর তর সয় না, বলে লোকজন কাজে বেরিয়ে গেলে দুপুরবেলাতেই আসব। ...তুই ত আর কুলের বউ ন'স! মানুষ-জন তোর ঘরে আসবে, বসবে, তাতে ভয়টা কাকে শুনি? তুই হলি বেবুশ্যে। ...ন্যাকামি দেখলে গা জ্বালা করে— এখন আমরাও যা, তুইও সেই পদার্থ। ভদ্দরনোক আসচে, নে ঘরে বসা।"[৪৫]

অর্থাৎ এখানে আমরা 'মিনসে', 'ন্যাকামি' প্রভৃতি শব্দগুলি দেখে সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে লিঙ্গভেদে মেয়েলি ভাষা বলতে পারি। আবার 'ভদ্দরনোক' শব্দের মধ্যে দ্বিত্বব্যঞ্জন এবং একই সাথে 'ল' ধ্বনি 'ন' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে, যা রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া 'ব্যাটার', 'ন্যাকামি' প্রভৃতি শব্দের মধ্যে দেখি 'এ' ধ্বনি 'অ্যা' ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়েছে যা বঙ্গালি উপভাষার বৈশিষ্ট্য কিন্তু সেইসঙ্গে রাঢ়ী উপভাষার কথ্য ভাষাতে 'অ্যা' ধ্বনির ব্যবহার চোখে পড়ে। ফলে সব দিক থেকে দেখা যায় লেখক চরিত্রের মুখে বর্গের ভিত্তিতে নিম্নবর্গের মুখের ভাষায় সাহিত্য রচনা করে তা বাস্তবসম্মত করে তুলেছেন।

এ প্রসঙ্গে চরিত্র নির্মাণের ভাষা নিয়ে ড. পবিত্র সরকার মহাশয় লিখেছেন—

> "কাহিনীতে চরিত্রটিকে প্রথম আনার মুহূর্তে লেখক তার শারীরিক ও মানসিক কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা পাঠককে জানিয়ে দেন। এই জানানোর ব্যাপারটা সাধারণভাবে দু'রকম। এক, লেখক সোজাসুজি একটা তালিকা পাঠকের সামনে হাজির করেন— চরিত্রটিকে দেখতে এইরকম তার ভাবভঙ্গি কথাবার্তা এইরকম। দুই, তার আচরণ বা কথাবার্তা সাজিয়ে দেন, কখনো বা নিজেই দু একটি মন্তব্যে তার বাইরেকার ও ভিতরকার পরিচয় এর উপর আলোক নিক্ষেপ করেন।"[৪৬]

'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসের এক নং পরিচ্ছেদে রাসমণি যখন তার নাতনীর উদ্দেশ্যে বলে—

> "ওলো ছুড়ী, দড়িটা ডিঙুসনি, ডিঙুলি? হারামজাদী, সগগপানে চেয়ে পথ হাঁটচ। চোখে দেখতে পাওনা যে ছাগল বাঁধা রয়েচে।"[৪৭]

অর্থাৎ এ ভাষার মধ্যে দেখি 'ওলো' শব্দটিকে সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে লিঙ্গোপভাষা (Genderlect) বলতে পারি; যেটি সাধারণত মেয়েদের মুখের ভাষায় দেখা যায়। এছাড়া 'সগগপানে' শব্দটির মধ্যে দেখি বিষম যুক্তব্যঞ্জন সমব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে। ফলে সবদিক থেকেই চরিত্রের মুখের ভাষা বাস্তবসম্মত হয়ে উঠেছে।

আবার যখন দেখি রাসমণি জিজ্ঞেস করে দুলে মেয়েটিকে, এ পাড়ায় কেন এসেছিস? তখন দুলে মেয়েটি বলে—

> "ঠাকুরমশাই তেনার ওই গইলের ধারে আমাদের থাকতে দিয়েচে। মাকে আর আমাকে দাদামশাই তেইড়ে দিয়েচে না!"[৪৮]

অর্থাৎ এখানে আমরা 'গইলের' এবং 'তেইড়ে' শব্দগুলির মধ্যে থাকা 'ই' ধ্বনিটি নির্দিষ্ট স্থানে উচ্চারিত হওয়ার আগেই উচ্চারিত হয়েছে যা অপিনিহিতির লক্ষণ এবং একইসঙ্গে বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া এই শব্দগুলি দিয়ে নিম্নবর্গীয় দুলে চরিত্রটিকে মৃত্তিকাগন্ধি করে তুলেছে। এ ভাষার মধ্যে যেন মাটির বুনো বন্ধ উঠে আসে। ফলে ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়েই লেখক চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন, ফলে আমরা আমাদের পর্যালোচনায় তুলে ধরেছি।

এছাড়া যখন দেখি জগদ্ধাত্রী এসে সন্ধ্যাকে বলে—

> "দুলে মাগীদের সরাবি, না আমাকেই কাল নাইবার আগে ঝাঁটা মেরে তাড়াতে হবে?"[৪৯]

এখানেও দেখি লেখক 'মাগী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন যা এখনকার দিনে বদকথা (Slang) মনে হলেও সেকালের দিনে শব্দটি সচরাচর শব্দ বা চলশব্দ হিসাবেই ব্যবহার করা হত। ফলে ভাষার মধ্য দিয়েই চরিত্রগুলির বাস্তবতা খুঁজে পাই।

'দেনাপাওনা' উপন্যাসের মধ্যে দেখি জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর গোমস্তা এককড়ী নন্দীর মুখের ভাষা, সে যখন বলে—

> "কি করব হুজুর, সদরে আরজি করে সুবিচার পাই নে— দেওয়ানজী গেরাহ্যিই করেন না, নইলে চক্কোত্তিকে টিট্ করতে কতক্ষণ লাগে! কিন্তু এত্ত নিবেদন করচি হুজুর আশকারা দিলে ওরা রোজা বিগড়ে দেবে— তখন গাঁ শাসন করা ভার হবে।"[৫০]

অর্থাৎ এখানে দেখি 'আরজি' শব্দটি একটি আরবি শব্দ যা লেখক ব্যবহার করেছেন আবেদনপত্র হিসাবে। আবার 'গেরাহ্যি', 'চকোত্তি' প্রভৃতি শব্দ গুলি তলভাষী(Basilect) শব্দ যা লেখক চরিত্রের মুখে বসিয়ে পাঠকের সামনে তাঁর রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার অন্যদিকে 'চক্কোত্তি' শব্দের মধ্যে দিত্বব্যঞ্জন ঘটেছে। এছাড়া 'গাঁ' শব্দটি মূলত সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে দেখলে তা অর্থনৈতিক ভিত্তিতে দুর্বল মানুষের মুখের কথ্য ভাষা হিসাবে পরিলক্ষিত হয়। লেখক সেই সকল শব্দকেই ব্যবহার করে যেন চরিত্রের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা এনেছেন ফলে আমরা তুলে ধরেছি।

আবার এই উপন্যাসের মধ্যে তিন নং পরিচ্ছেদে জীবনানন্দের মুখের ভাষা দেখি, তিনি যখন ষোড়শীকে উদ্দেশ্য করে বলেন—"তোমার কথাগুলো শুনতে মন্দ নয়, কিন্তু কান্না দেখে আমার দয়া হয় না। ও আমি অনেক শুনি। মেয়ে মানুষের ওপর আমার এতটুকুও লোভ নেই— ভালো না লাগলেই চাকরদের দিয়ে দিই। তোমাকেও দিয়ে দিতুম, শুধু এই বোধ হয় আজ প্রথম একটু মোহ জন্মেছে। ঠিক জানিনে— নেশা না কাটলে ঠাওর পাচ্ছিনে।"[৫১] অর্থাৎ এখানে আমরা সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ধনী শ্রেণির মানুষ বলব কিন্তু শিক্ষা সংস্কৃতিতে তাকে অভদ্র শ্রেণিতে ফেলা যায়, কেননা মহিলার প্রতি তিনি এতোটুকুও সম্মান প্রদর্শন করেননি বরং উল্টে অসম্মান বাচক কথা বলেছেন। ফলে তার এই ভাষার মধ্য দিয়েই চরিত্রটির নারীর প্রতি মনোভাব যথার্থভাবে ফুটে উঠেছে বলে আমরা মনে করেছি।

এছাড়াও উপন্যাসের পাঁচ নং পরিচ্ছেদে দেখি তারাদাস যে গড়চণ্ডীর সেবায়েত, সে যখন ষোড়শীকে বলে—

"হারামজাদী, তোকে যদি না খুন করি ত আমি মনোহর চক্কোত্তির ছেলে নই।"[৫২]

এখানে লেখক তারাদাসকে সেবায়ত হিসেবে দেখালেও 'হারামজাদী' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন তার মুখে। তারাদাস চক্রবর্তী জন্মগতভাবে ব্রাহ্মণ ফলে উচ্চবর্গীয় কিন্তু তার মুখের ভাষা তাকে নিম্নবর্গে নামিয়ে এনেছে। কেননা 'হারামজাদী' শব্দটি নিম্নবর্গের মানুষের মুখের কথ্য ভাষা হিসেবেই দেখা যায়। তাছাড়া 'চক্কোত্তি' শব্দটির মধ্যে দিত্বব্যঞ্জন এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, যা রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য। ফলে ভাষার মধ্য দিয়েই চরিত্রটির বাস্তব রূপ ধরা পড়েছে তাই আমরা আমাদের পর্যালোচনায় তুলে ধরেছি।

আবার উপন্যাসের সাত নং পরিচ্ছেদে ষোড়শীর দাসীকে পাই যে জন্মগতভাবে কায়স্থের মেয়ে। দাসী যখন বলে—

> "কদিন যে উপোস করচ মা, তা কে জানে! মেলেচ্ছ বেটাদের ঘরে যে তুমি জলটুকু ছোঁবে না তা আমি বেশ জানি।"[৫৩]

অর্থাৎ এখানে আমরা দেখি 'মেলেচ্ছ' শব্দটির মধ্যে ধ্বনিগত দিক থেকে মধ্যস্বরাগম ঘটেছে, যা নিম্নবর্গীয় মানুষের মুখের ভাষা সেটা লেখক লেখ্য ভাষাতেও ব্যবহার করে চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার 'ব্যাটা' শব্দটিতেও 'এ' ধ্বনি 'অ্যা' ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়েছে যেটি বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয়। ফলে সকল দিক থেকেই লেখকের ভাষা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

ড. অজিতকুমার ঘোষ মহাশয় এ প্রসঙ্গে বলেন—

> "শরৎচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে বর্ণনামূলক রীতি ও সংলাপাশ্রয়ী নাট্যরীতি উভয় রীতিই গ্রহণ করিয়াছেন। উপন্যাসে তিনি যে সংলাপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা পরিমিত, আবেগগর্ভ ও ইঙ্গিতধর্মী। তিনি নিজে এক স্থানে বলিয়াছেন, 'Dialogue ছোট হওয়া চাই, মিষ্টি হওয়া চাই— কিছুতেই না মনে হয় এ প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা অক্ষর বেশি বলেছে। এই হল 'artistic form- এর ভিতরের রহস্য।' সংলাপের অনেক স্থলেই তিনি হৃদয় বৃত্তির পরস্পরবিরোধী ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহার সংলাপ ঘনীভূত নাট্যরস সৃষ্টিতে সক্ষম হইয়াছে।"[৫৪]

'বিপ্রদাস' উপন্যাসের মধ্যে দেখি দুই নং পরিচ্ছেদে যখন বিপ্রদাসের মা যে পৌঢ়া বিধবা মহিলা বিপ্রদাসকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

"হাঁ রে বিপিন, শুনচি নাকি একাদশী নিয়ে এ মাসে পাঁজিতে গোল বেধেছে? এমন ত কখনও হয় না।"[৫৫]

অর্থাৎ এখানে দেখি এই ভাষার মধ্যেই আমরা গ্রামের বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মুখের কথ্য ভাষা হিসাবে 'হাঁ' ও 'পাঁজি' শব্দ দুটিকে তলভাষী (Basilect) শব্দ হিসাবে পাই যা চরিত্রটিকে বাস্তবসম্মত করে তুলেছে।

আবার বিপ্রদাস যখন তার মাকে উদ্দেশ্য করে বলে—

> "তার কারণ আছে মা, ইস্কুলের ক্লাসে প্রমোশন না পেয়ে ও নালিশ করলে আমার সয় না, কিন্তু দ্বিজুর মত এম.এ. পাস করে বিলিতি শিক্ষাকে যত খুশি গাল দিয়ে বেড়াক আমার গায়ে লাগে না।"[৫৬]

অর্থাৎ এখানে আমরা কতকগুলি ইংরেজি শব্দের ব্যবহার পাই, যেমন— ইস্কুল, ক্লাস, প্রমোশন, এম.এ প্রভৃতি। যার ফলে চরিত্রটি জীবন্ত রূপ পেয়েছে আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্যামলচন্দ্র দাস মহাশয় বলেন—

> "চরিত্রের সংলাপে হলে তা চরিত্র বা উপন্যাস পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী লেখককে করতে হয়। চরিত্র বা সমাজ-মনস্তত্ত্ব এর সঙ্গে অভিযোজন যথাযথ না হলে তা লেখক-শিল্পীরা সাধারণত প্রয়োগ করেন না।"[৫৭]

অর্থাৎ উপন্যাসের বা গল্পের চরিত্রের ভাষা লেখককে নির্বাচন করতে হয় পরিবেশ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। সেইসঙ্গে চরিত্রের Mental Structure এর ওপর ভিত্তি করেই ভাষা বসাতে হয় লেখককে; তবেই চরিত্রটি বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠে বলে আমরা মনে করি।

সবশেষে আমরা একথা বলতে পারি শরৎচন্দ্রের গদ্যের বাক্যগঠন, বাক্যের অন্বয়গত অবস্থান, শব্দসংস্থান অত্যন্ত যথাযথ। সহজ পরিচিত জীবন থেকে শব্দ নিয়ে তার ব্যবহার আমাদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। সরল-জটিল-যৌগিক বাক্য দিয়ে বর্ণনা করে গদ্য ভাষাকে প্রবাহমানতা দিয়েছিল। সুবিন্যস্ত গতি এবং হ্রস্ব-দীর্ঘ বাক্য পরম্পরায় তাঁর ভাষারীতি চিত্রধর্মিতা সৃষ্টি করেছিল। সেই সঙ্গে শরৎচন্দ্র স্পষ্ট ভাষায় সহজভাবে, দুঃখ-বেদনার কথা, সমাজের সমস্যার কথা, নিম্নবর্গের কথা তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। একইভাবে সমাজে প্রচলিত সংস্কার, নীতিবোধ, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি দিকগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন ভাষা-সংলাপের দ্বারা। সবমিলিয়ে তাই বলা যাই সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের কিছুটা দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নিম্নবর্গের ভাষা-সংলাপ নির্মাণে অনেকখানি সফল একথা বলাই বাহুল্য।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড)। বাংলা ভাষা পরিচয়। বিশ্বভারতী পাবলিশার্স, ১৪০২। পৃ. ৫৭২।

২. সরকার, পবিত্র। গদ্যরীতি পদ্যরীতি। সাহিত্যলোক পাবলিশার্স,১৯৮৫। পৃ. ৭৪-৭৫।

৩. Lodge David, Language of Fiction, columbia university press, 1966, p.g 51.

৪. দাশ, ড. নির্মল। বাংলা উপন্যাসের ভাষা শরৎচন্দ্র ও উত্তরকালে। উৎস: উত্তরকাল ও শরৎচন্দ্র, শিশির মজুমদার সম্পাদিত। এস ব্যানার্জি এণ্ড কোং, ১৯৬০। পৃ. ১৮৭।

৫. সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র। শরৎচন্দ্র। এ মুখার্জি এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড পাবলিশার্স, ১৩৮১। পৃ. ৮১।

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর। দে'জ পাবলিশার্স, ২০১২। পৃ. ৪৩।

৭. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শরৎ রচনাবলী(দ্বিতীয় খন্ড)। অভাগীর স্বর্গ। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩। পৃ. ১০২০।

৮. তদেব, পৃ. ১০২০।

৯. তদেব, পৃ. ১০২১।

১০. তদেব, বিলাসী। পৃ. ৯৭৯।

১১. তদেব, পৃ. ৯৮২।

১২. তদেব, মহেশ। পৃ. ১০১১।

১৩. তদেব, পৃ. ১০১৭।

১৪. তদেব, পৃ. ১০১৮।

১৫. তদেব, মন্দির। পৃ. ৯০৯।

১৬. তদেব, হরিচরণ। পৃ. ৯৫৮।

১৭. মৈত্র, সুরেশচন্দ্র, সম্পাদিত। শরৎ সাহিত্যের ভূমিকা। পুঁথিপত্র পাবলিশার্স, ১৯৭৭। পৃ. ২৭২।

১৮. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শরৎ রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড)। বিরাজ বৌ। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩। পৃ. ৬৫৯।

১৯. তদেব, পৃ. ৬৫৯।
২০. তদেব, পন্ডিতমশাই। পৃ. ৩৮৯।
২১. তদেব, পৃ. ৩৯৬।
২২. তদেব, পৃ. ৩৮০।
২৩. তদেব, পৃ. ৩৮৯।
২৪. দাস, শ্যামলচন্দ্র। পন্ডিতমশাই: পন্ডার শৈলী। উৎস: পন্ডিতমশাই বিপর্যয়ের বর্ণমালা, দেবব্রত বিশ্বাস ও শ্যামলচন্দ্র দাস সম্পাদিত। প্রজ্ঞা বিকাশ পাবলিশার্স, ২০১৪। পৃ. ১৭৭-১৭৮।
২৫. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শরৎ রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড)। পন্ডিতমশাই। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩। পৃ. ২৩৭।
২৬. তদেব, পৃ. ২৫৮।
২৭. তদেব, পৃ. ২৬২।
২৮. দাস, শ্যামলচন্দ্র। ভাষা শৈলীর পল্লীসমাজ। উৎস: বিশ্লেষণী আলোয় পল্লীসমাজ, ড. সুজিত কুমার পাল সম্পাদিত। প্রত্যয় প্রকাশনী, ২০১৫। পৃ. ১৩৩।
২৯. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শরৎ রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড)। অভাগীর স্বর্গ। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩। পৃ. ১০২৪।
৩০. তদেব, পল্লীসমাজ। পৃ. ২৩৮।
৩১. তদেব, পৃ. ২৩৮।
৩২. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শরৎ রচনাবলী (প্রথম খন্ড)। শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব)। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩। পৃ. ৬৩।
৩৩. তদেব, পৃ. ৬২।
৩৪. তদেব, শ্রীকান্ত (দ্বিতীয় পর্ব)। পৃ. ১৩৪।
৩৫. তদেব, পৃ. ১৪২-১৪৩।
৩৬. তদেব, পৃ. ২০০।
৩৭. তদেব, শ্রীকান্ত (তৃতীয় পর্ব)। পৃ. ২৪০।
৩৮. তদেব, পৃ. ২৭৯।
৩৯. তদেব, দেবদাস। পৃ. ৬৯৩।
৪০. তদেব, পৃ. ৭৪১।
৪১. তদেব, পৃ. ৭৫১।
৪২. তদেব, পৃ. ৭৫৩।
৪৩. তদেব, চরিত্রহীন। পৃ. ৪৬১।
৪৪. তদেব, পৃ. ৪৬৫।
৪৫. তদেব, পৃ. ৬৭১-৬৭২।
৪৬. সরকার, পবিত্র। উপন্যাসের ভাষাশিল্প ও শরৎচন্দ্র। উৎস: শরৎ সাহিত্যের ভূমিকা, সুরেশচন্দ্র মৈত্র সম্পাদিত। পুঁথিপত্র পাবলিশার্স, ১৯৭৭। পৃ. ২৭৩।
৪৭. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শরৎ রচনাবলী (তৃতীয় খন্ড)। বামুনের মেয়ে। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩। পৃ. ৫১৭।

৪৮. তদেব, পৃ. ৫১৮।
৪৯. তদেব, পৃ. ৫৩৭।
৫০. তদেব, দেনাপাওনা। পৃ. ৭৬৪।
৫১. তদেব, পৃ. ৭৭২।
৫২. তদেব, পৃ. ৭৭৭।
৫৩. তদেব, পৃ. ৭৮৮।
৫৪. ঘোষ, ড. অজিতকুমার। শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩। পৃ. ৩৩৯।
৫৫. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শরৎ রচনাবলী (তৃতীয় খন্ড)। বিপ্রদাস। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩। পৃ. ২৫৩।
৫৬. তদেব, পৃ. ২৫৩-২৫৪।
৫৭. দাস, শ্যামলচন্দ্র। পন্ডিতমশাই: পন্ডার শৈলী। উৎস: পন্ডিতমশাই বিপর্যয়ের বর্ণমালা, দেবব্রত বিশ্বাস ও শ্যামলচন্দ্র দাস সম্পাদিত। প্রজ্ঞা বিকাশ পাবলিশার্স, ২০১৪। পৃ. ১৭৯।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ঘোষ, ড. অজিতকুমার। শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩।
২. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শরৎ রচনাবলী (প্রথম খন্ড)। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩।
৩. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শরৎ রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড)। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩।
৪. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শরৎ রচনাবলী (তৃতীয় খন্ড)। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩।
৫. দাশ, ড. নির্মল। বাংলা উপন্যাসের ভাষা শরৎচন্দ্র ও উত্তরকালে। উৎস: উত্তরকাল ও শরৎচন্দ্র, শিশির মজুমদার সম্পাদিত। এস ব্যানার্জি এণ্ড কোং, ১৯৬০।
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর। দে'জ পাবলিশার্স, ২০১২।
৭. সরকার, পবিত্র। গদ্যরীতি পদ্যরীতি। সাহিত্যলোক পাবলিশার্স,১৯৮৫।
৮. সরকার, পবিত্র। উপন্যাসের ভাষাশিল্প ও শরৎচন্দ্র। উৎস: শরৎ সাহিত্যের ভূমিকা, সুরেশচন্দ্র মৈত্র সম্পাদিত। পুঁথিপত্র পাবলিশার্স, ১৯৭৭।